গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা | ২২ - ২৮ জুলাই ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

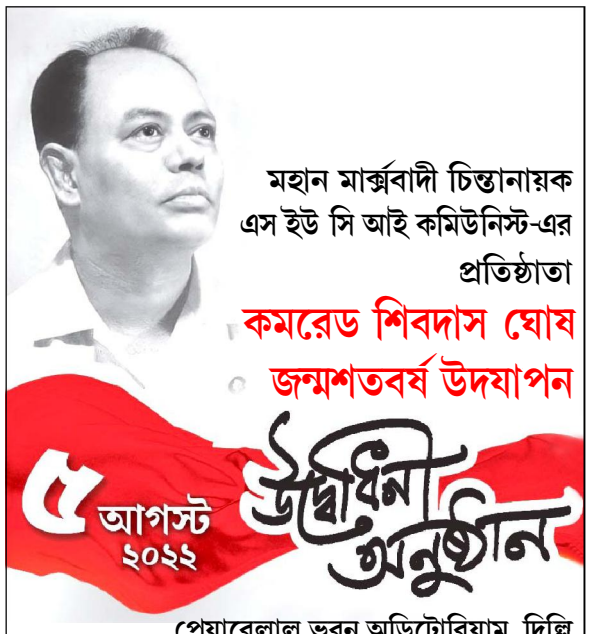

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপনে
সাম্যবাদী আন্দোলনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলুন

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী যোদ্ধা, ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা-সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯২৩ সালের ৫ আগস্ট তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের ও বিশ্বের শোষিত শ্রেণির সামনে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা, আদর্শ এবং সংগ্রামকে তুলে ধরে ভারতের তথা বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনকে দিশা দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমরা ৫ আগস্ট ২০২২ থেকে বর্ষব্যাপী তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন করতে উদ্যোগী হয়েছি।

সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্ব চূড়ান্ত সঙ্কটে নিমজ্জিত। সারা বিশ্বে প্রবল ক্ষমতাশালী পুঁজিবাদী শোষণে সাধারণ মানুষ হাহাকার করছে। শ্রমিক শ্রেণির শক্তিশালী বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসন প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী শক্তিগুলিকে মাথা তুলতে আরও সাহায্য করছে। প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে সর্বব্যাপক মন্দার কারণে সরকারি-বেসরকারি অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা বন্ধ হতে বসেছে, যার ফলে কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। সমস্ত দেশেই বেকারবাহিনী বিপুল সংখ্যায় বাড়ছে। তারা অভুক্ত এবং গৃহহীন অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এরই পরিণতিতে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং বিশাল সংখ্যক গরিব আরও গরিব হচ্ছে। কৃষকদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। নির্বাচন এখন সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত হয়েছে, প্রতারণা চরম রূপ নিয়েছে। পাশাপাশি সমগ্র জাতিকে এক নৈতিক সঙ্কট গ্রাস করেছে। জনগণের নৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। শুধু ভারতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

গণতন্ত্রের প্রাণহীন খোলস ছাড়া কিছুই রাখছে না বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্রী ফাঁস আরও দৃঢ় করার দুরভিসন্ধি থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার লোকসভা ও রাজ্যসভায় একগুচ্ছ অতি প্রচলিত শব্দ ও বাক্যকে অসংসদীয় বলে চিহ্নিত করেছে। এইগুলি এতদিন প্রতিবাদ ও ক্ষোভ ব্যক্ত করতে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলি ব্যবহার করলে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে তা শুধু মুছে ফেলাই হবে না, শাস্তিযোগ্যও হবে। এরই পাশাপাশি সরকার সংসদ প্রাঙ্গণে উভয় কক্ষের সাংসদদের বিক্ষোভ-ধর্না-হরতাল-অনশন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার ফতোয়া জারি করেছে। সংসদে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে ভর করে বিজেপি শাসক পুঁজিপতিশ্রেণির বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার উদগ্র প্রচেষ্টায় সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণস্বত্তাকেই হত্যা করছে। প্রাণহীন গণতন্ত্রের ফাঁপা খোলসটাকেই দেখিয়ে তারা বিশ্বকে বোঝাতে চাইছে কত সুষ্ঠ ও সুন্দর গণতন্ত্র বিরাজ করছে ভারতে।

আমরা এই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এখনও গণতন্ত্রের যতটুকু অবশেষ টিকে আছে তাকে ধাপে ধাপে হত্যা করার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

প্রেসিডেন্ট পালাতে বাধ্য হলেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকেই গেল

শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুগে যুগে ফুঁসে ওঠা জনরোষের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসাবে থেকে গেল শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান। গোটা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের জন্য রেখে গেল অত্যন্ত স্পষ্ট দুটি শিক্ষা। দেখিয়ে দিয়ে গেল, যতবড় ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, জেগে ওঠা জনতার শক্তির কাছে অত্যাচারী শাসক বন্যার জলে খড়কুটো বৈ কিছু নয়। পাশাপাশি এ শিক্ষাও রেখে গেল, নিপীড়ক রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকে না পাল্টে শুধু শাসকের নাম বদলে জনগণের দুর্দশা ঘোচে না।

বিক্ষোভের সূচনা অনেক দিন আগে

সম্প্রতি যে জনবিক্ষোভের সাক্ষী থাকল শ্রীলঙ্কা, যার জেরে প্রাসাদ ছেড়ে মহাপরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষকে সস্ত্রীক দেশ ছেড়ে পালাতে হল, তার সূচনা অন্তত এক বছর আগে। এরও আগে দীর্ঘদিন ধরেই একটু একটু করে অর্থনৈতিক সঙ্কট গ্রাস করছিল এই দ্বীপরাষ্ট্রটিকে। মূলত আমদানি-রপ্তানি ও পর্যটন শিল্পের ওপর নির্ভরশীল শ্রীলঙ্কায় উৎপাদন শিল্প তেমন গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৮-এ স্বাধীন হওয়ার পর

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার কোনও সরকারই উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেয়নি। প্রথম দিকে পরিস্থিতি অনুকূল থাকলেও ১৯৬০-এর দশক থেকে রপ্তানি-আয়ের তুলনায় বাড়তে থাকে আমদানির খরচ। ঘাটতি মেটাতে সাহায্যের অছিলায় ঋণের ঝুলি নিয়ে প্রবেশ করে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থা আইএমএফ। ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে অর্থনীতির উদারিকরণের শর্ত চাপায়। ধীরে ধীরে বিদেশি ঋণ গ্রাস করতে থাকে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিকে। ১৯৭৭ সালে যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ডলার, ২০২০ সালে পৌঁছে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৬০০ কোটি ডলারে। এই ঋণের অধিকাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৮১ শতাংশের যোগানদার আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থা, জাপান ও ভারত। চিনও আছে ঋণদাতার তালিকায়। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বের কারণে আর্থিক সাহায্য, ঋণ ও নানা ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সবক'টি দেশই। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায়

সাতের পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবি পূর্ব মেদিনীপুরে

পূর্ব মেদিনীপুরের বল্লুকে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে নাগরিকদের রাস্তা অবরোধ। খবর চারের পাতায়

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে

সাম্যবাদী আন্দোলনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলুন

একের পাতার পর

নয়, বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের এই হচ্ছে চেহারা। সব দেশেই মানুষ এর থেকে মুক্তি চাইছে। বিক্ষোভও উত্তাল ঢেউয়ের মতো ফেটে পড়ছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির থেকে সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারছে না। এ রাস্তায় পদক্ষেপ করতে হলে প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজন সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক সাম্যবাদী দল। মহান লেনিনের এই শিক্ষাকে বারবার তুলে ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তোলার জন্য তরুণ বয়সে ১৯৪০-এর দশকে এক অকল্পনীয় দুরূহ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সিপিআই নেতাদের সততা ও আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়েও তাঁদের সকল নীতি ও কার্যকলাপের মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই দলটি একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে তিনি ভারতবর্ষে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। অর্থ-সম্পদহীন, প্রচারহীন এক তরুণের এই দুঃসাহসিক সংকল্পকে সেদিন অনেকেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন, অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বাধাই তাঁকে আটকাতে পারেনি। তিনি এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিপ্লবী-দুঃসাহসের সাথে দল প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেছেন। তাঁর সহযোগীদের বলেছেন, "যাঁরা এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় থাকার সাহস নিয়ে থাকতে পারবেন, তাঁরা থাকুন। অন্যেরা না পারলে চলে যান। আমি জানি, আমি অনাহারে রাস্তায় পড়ে মরে থাকতে পারি। বুঝব, ভারতবর্ষে বিপ্লবের আয়োজনের প্রয়োজনে এটা হয়ত দরকার ছিল। কিন্তু আমি যে সবার বিবেকের কাছে বিপ্লবী আদর্শ ও বিপ্লবী পার্টির অপরিহার্যতার আবেদন জানিয়ে যাব, তা ব্যর্থ হবে না, ব্যর্থ হতে পারে না। ইতিহাস তার মূল্য দেবেই।" আজ এই দলের সংগঠন ২৩টি রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছে এবং সর্বত্রই এ দলের নেতা-কর্মীরা জনগণের সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে লড়াই-আন্দোলন চালাচ্ছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, মহান সাম্যবাদী আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত আছে তার উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতির মধ্যে। তিনি আরও দেখালেন, স্বাধীন ভারতবর্ষ একটি পরিপূর্ণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যাকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই একমাত্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে। তার ফলে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি— সব কিছুই অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করতে পারবে। আসলে ক্ষয়িষ্ণু মরণোন্মুখ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমস্ত অগ্রগতির পথে জগদ্দল পাথরের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব করতেই হবে। কিন্তু এ শুধু মুখে বললে বা গরম ভাষায় বক্তৃতায় বললে হবে না। এই নতুন উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নত চরিত্রের বিপ্লবী চাই। এই লক্ষ্যেই তিনি দলের নেতা ও কর্মীদের এমন ভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন, যাতে তাঁরা দেশের শোষিত মেহনতি মানুষের সামনে আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র হিসাবে দাঁড়াতে পারেন। শুরু থেকেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের মধ্যে বিপ্লবী চরিত্র গড়ার সংগ্রামের ওপরেই তিনি জোর দিয়েছেন।

বিপ্লবী তত্ত্ব মানে কেবল বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করা বোঝায় না। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিকল্প হিসাবে জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে মার্কসবাদী তথা সমাজতন্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ আয়ত্ত করা ছাড়া পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা যাবে না।

দল গঠনের ওই কঠিন সংগ্রামের সময়েই তিনি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত আলোচনা উপস্থিত করলেন। মহান স্ট্যালিন ও মহান মাও সে তুং-কে নিজের শিক্ষক রূপে গণ্য করেও তিনি তাঁদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার কথা বলেননি, নিজেও করেননি। তিনি দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক হবে দ্বান্দ্বিক।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে হাজার বার সরকার পরিবর্তিত হলেও পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। মানবমুক্তির একমাত্র পথ হল সঠিক রাজনৈতিক মূল লাইনের ভিত্তিতে জনগণের বিপ্লবী সংঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা এবং শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।

তিনি দেখালেন, বিপ্লবী তত্ত্ব মানে কেবল বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করা বোঝায় না। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিকল্প হিসাবে জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে মার্কসবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ আয়ত্ত করা ছাড়া পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা যাবে না। মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গণ্য করে তিনি বললেন, যারা মার্কসবাদী হবে, তাদের সর্বহারা বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে নিজেদের সমস্ত প্রকারের বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় পেশাদার বিপ্লবীতে পরিণত হতে হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ, যৌথ নেতৃত্ব, দলের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ রেখে গেছেন, যেগুলি না জানলে ও চর্চা না করলে কোনও দেশেই আজকের যুগে যথার্থ বা সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে না। তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন কালে এই সত্যটাও আমরা বিশ্বের সকল দেশের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের কাছে তুলে ধরতে চাই।

ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামগ্রিক রূপরেখা তিনিই দিয়ে গেছেন। এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি ভারতবর্ষের সর্বহারা বিপ্লবের নেতা ও শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। এ দেশে যাঁরাই শোষিত শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রাম তথা সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে চান, তাঁদের সকলকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন, সংগ্রাম ও শিক্ষাগুলিকে বারবার অধ্যয়ন করে আত্মস্থ করতে হবে। এই মহান নেতা ও শিক্ষকের জন্মশতবর্ষ উদযাপন এই আহ্বান নিয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য দুরারোগ্য লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৩ জুলাই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। গত দু-বছর তিনি নানা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে দলীয় কর্মী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরদিন বিকেলে তাঁর মরদেহ জেলা কার্যালয়ে আনা হলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার নেতৃবৃন্দ ও কর্মী সমর্থকেরা, বহু শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

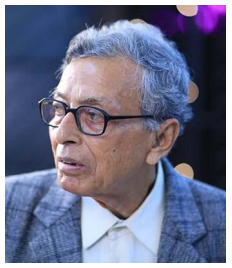

জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার সূচনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান কর্মী সমর্থক দরদিদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র দিলীপ ভট্টাচার্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় এসে তালতলা হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। পারিবারিক সূত্রে অরুণ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে কমরেড সুধীর পালের সাথে যোগাযোগ ঘটে এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৭ সালে এ আই ডি এস ও-র বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সলিল চক্রবর্তী জলপাইগুড়িতে এলে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ও তার সহপাঠী এবং বন্ধুদের নিয়ে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হন। সেখান থেকেই তিনি দলীয় কাজে আত্মনিয়োগ শুরু করেন। পার্টির আহ্বানে সংগঠনের প্রয়োজনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে আনন্দচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৮ সালে কমরেড জয়দেব মণ্ডল ওই কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ওই বছরেই ভয়ঙ্কর বন্যায় জলপাইগুড়ি শহর তছনছ হয়ে যায়। বন্যা পরবর্তী সময়ে দিলীপ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে রিলিফ ওয়ার্ক, টেক্সট বুক লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়। কাদোবাড়ি ও বোয়ালমারিতে সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়। সেই সময় জলপাইগুড়িতে তিনি একমাত্র সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কষ্টকর জীবন সানন্দে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যে কাজই করুন তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুনিপুণভাবে গুছিয়ে করতে পারতেন। তিনি নির্ভীক ভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকরী করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অনন্যসাধারণ চরিত্রের গুণে বহু মানুষকে তিনি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ধীরে ধীরে জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকে সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, ময়নাগুড়িতে সংগঠন বিস্তার লাভ করে।

মোহিত নগরে সরকারি কৃষি খামারে তিনি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলে তাদের বহু দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রয়াত কমরেড উৎপল রায়ের উদ্যোগে রামঝোরা চা-বাগানে পার্টি ইউনিট ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পর কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য উক্ত বাগানে সাংগঠনিক কাজ দেখাশোনা করার জন্য নিয়মিত যেতেন। ওই বাগানের প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের নেতারা মালিক পক্ষের সহায়তায় বোনাস দেওয়ার সময় অফিস থেকে ইউনিয়নের চাঁদা কেটে রেখে শ্রমিকদের বোনাস দিতেন। তার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলন গড়ে তুললে সেই আন্দোলন ধ্বংস করতে ওই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাথায় আটটা সেলাই পড়ে সে যাত্রায় কোনওক্রমে তিনি বেঁচে যান। জরুরি অবস্থার সময় যখন সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে জলপাইগুড়ি জেলায় শরৎ জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক জয়দেব মণ্ডল। এই কমিটির উদ্যোগে জেলা জুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল এবং পার্টির সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল। এই কমিটিকে সুনিপুণ পরিচালনার ক্ষেত্রেও কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ১৯৮০ সালে তাঁর নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ পাট চাষি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির নেতৃত্বে পাটের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার একাংশে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই কমিটির নেতৃত্বে কৃষকদের পক্ষ থেকে দিল্লিতে এগ্রিকালচার প্রাইস কমিশনের চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাট চাষিদের দাবিগুলো সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ে আসা হয়। ১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন, পরবর্তীকালে কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস গড়ে তোলার জন্য তাকে রাজ্য স্তরে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে দল হারালো একজন একনিষ্ঠ নেতাকে এবং জনগণ হারালো তাদের প্রিয় আপনজনকে। তাঁর স্মরণসভা ২৪ জুলাই জলপাইগুড়ি শহরে। প্রধান বক্তা দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য লাল সেলাম

শ্রেণিগত বিচার বাদ দিয়ে ‘দেশের স্বার্থ’ কথাটি অর্থহীন

শিবদাস ঘোষ

আগামী ৫ আগস্ট শুরু হচ্ছে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ। সারা দেশ জুড়ে শোষিত নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা উদযাপন করবেন। এই উপলক্ষে ‘গণদাবী’র পক্ষ থেকে তাঁর মূল্যবান বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতার নানা অংশ প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যায় ১৯৬৭-র ১৭ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণের অংশবিশেষ প্রকাশ করা হল।

... ভারতবর্ষের একটা নকশা, ... অল্প কথায় আপনাদের সামনে রাখতে চাই। স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ছিল— অর্থাৎ সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি, জনগণের কল্যাণের অর্থে সুখী-সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষ— তা আজও গড়ে ওঠেনি। পরন্তু, যা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থে একটি মজবুত শোষণমূলক অত্যাচারমূলক ‘সোসাল ইনজাস্টিস’-এর (সামাজিক অবিচারের) উপর ভিত্তি করে এমন একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা— যা জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের সমাজের বুকে, জনসাধারণের বুকের ওপর চেপে বসেছে। আর এই ব্যবস্থাটি এবং এই ঘটনাটিই হচ্ছে সমস্ত সামাজিক সমস্যা, যুবসমস্যা, সমাজপ্রগতির সমস্যার সামনে একটি প্রধান ঘটনা ও বাধাস্বরূপ। ... আপনাদের সামনে যা কিছু সমস্যা তার মূল কারণই হচ্ছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। এ যদি আপনারা মেনে নেন, এবং যুক্তিবাদী হলে এ কথা অস্বীকার করার উপায়ও নেই, তা হলে কোনও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনই শোষিত জনসাধারণের মূল রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন হতে পারে না, ‘অ্যাপলিটিক্যাল মুভমেন্ট’ হতে পারে না। ... এই যখন অবস্থা তখন হয় শোষকশ্রেণি, না হয় শোষিতশ্রেণি— এর কোনও একটির রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিজেদের যুক্ত হতেই হবে। আপনারা নিশ্চয়ই শোষকশ্রেণির রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ— কোনও ভাবেই নিজেদের যুক্ত করতে চান না। কাজেই আপনাদের যুব আন্দোলন এবং যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আপনারা পরিচালনা করছেন তার সামনে আজ মূল সমস্যা হচ্ছে, কী করে এই আন্দোলনগুলোকে দেশের শোষিতশ্রেণির শোষণমুক্তির বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

একদল লোক যাঁরা বলেন, ছাত্র বা যুবসমাজ রাজনীতি বিমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র সমাজকল্যাণের কথা ভাববে— তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে। তাঁদের মধ্যে কিছু ‘জেনুইনলি কনফিউজড’ (সত্যিকারের বিভ্রান্ত) লোক থাকতে পারেন— সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু তাঁদের এই প্রচারের পেছনে যে শ্রেণিউদ্দেশ্য কাজ করছে তা হচ্ছে, যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজকে রাজনীতি বিমুখ করে তোলা। অথচ, গোটা দেশের সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি শোষিত শ্রেণিগুলির মূল রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক— কোনও ব্যক্তিবিশেষের রাজনীতি সম্বন্ধে খুব উন্নাসিক একটা বিরূপ মনোভাব থাকুক বা আর যাই হোক— এ বাস্তব ঘটনা। একমাত্র গায়ের জোর ব্যতিরেকে একে অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন, এ সমাজে যে বৈষম্য— এ তো একটা বাস্তব ঘটনা। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত— এ একটা বাস্তব ঘটনা। আমরা বলছি বলে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত, বা আমাদের মতো কিছু লোক মনে করে বলে ভারতবর্ষের সমাজটা শ্রেণিবিভক্ত— এ নয়। ভারতবর্ষের সমাজ ঐতিহাসিক কারণেই শ্রেণিবিভক্ত। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক— এ সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়েছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। এর একদিকে অত্যাচারিত, শোষিত, খেটেখাওয়া মানুষ— শ্রমিক, খেতমজুর, গরিব চাষি, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, ‘ইন্‌টেলেকচুয়াল’ (বুদ্ধিজীবী) সম্প্রদায়। অপর দিকে বড় বড় পুঁজিপতি, বড় বড় ব্যবসাদার, ধনী চাষি— এরা এবং এই শোষকশ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক শক্তি। এই শ্রেণিবিভাগ আমরা করিনি। এটা না হলে হয়তো ভাল ছিল। মালিক মজুর যদি ইতিহাসে সৃষ্টি না হত, আমরা আপত্তি করতাম না। ধনীচাষি, ভাগচাষি, খেতমজুর যদি সৃষ্টি না হত, আমরা আপত্তি করতাম না। আমরা চেয়েছি বলে এ জিনিস হয়নি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে হয়েছে। ফলে, দোষটা এখন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ নেই। ... এই বাস্তব সত্যকে সাহসের সাথে স্বীকার করতে হবে। এই সত্যকে বুঝে এর চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে। এর মানে কী? মানে এই যে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত— এই শোষক-শোষিতের মধ্যে যে নিয়ত সংগ্রাম চলছে, যা আমাদের বানানো কথা নয় এবং যা আমাদের চেতনানিরপেক্ষ ভাবেই প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে। আর, এই সংঘর্ষে আবর্তিত হয়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের ‘ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি’, চিন্তাভাবনা, সামাজিক মনন— যা কিছু আমাদের মধ্যে আমরা দেখছি— তা এরই ‘সুপারস্ট্রাকচার’ (উপরিকাঠামো)— এই সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি এবং

৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

এই সংঘর্ষের দ্বারা আবর্তিত হয়ে চলেছে। সে-ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষের সঠিক রূপ নির্ধারণ না করে আমরা এক পা-ও এগোতে পারি না। এগোবার চেষ্টা করলে তা হবে অন্ধের মতো চেষ্টা করা। আর, অন্ধ ভাবে এগোতে গেলে যা হয়, এইরকম ভাবে এগোতে গেলে ঠিক তাই হবে। আমাদের সবাইয়ের ক্ষেত্রে তাই হবে।

তাই, ভারতবর্ষের এই শোষক ও শোষিত দুই ভাগে বিভক্ত সমাজ, বিভক্ত জাতি— এই শ্রেণিবিভক্ত জাতির পটভূমিকায় সমস্ত আন্দোলনগুলোর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে। এখানে একটা কথা আমি যুবকদের বলব যে, ‘দেশপ্রেম’, ‘দেশাত্মবোধ’, ‘দেশের ডাক’, ‘দেশের স্বার্থ’, ‘দেশের ঐক্য’— এইসব কথাগুলোর সাহায্যে দেশের প্রতিক্রিয়াশীলশ্রেণি, বুর্জোয়ারা বেশিরভাগ সময়ই যুবকদের দেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে বিপথে পরিচালিত করে থাকে। ... দেশকে ভালবাসা একটা মহৎ কাজ সন্দেহ নেই— কিন্তু দেশকে ভালবাসছি বলে মালিকের পদলেহন করা কোনও মহৎ কর্ম নয়। দেশের স্বার্থের নামে মালিকশ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করে চলা, আর নিজে ভাবতে থাকা যে আমরা দেশকে খুব ভালবাসি, আমরা দেশসেবক— এটা কোনও মহৎ কর্ম নয়। এটা দেশের প্রতি চরম শত্রুতা, না জেনে হলেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং শেষ পর্যন্ত দেশের চরম অনিষ্টই এর দ্বারা সাধিত হয়। তাই আমি বলছি, ‘আমাদের দেশ’, ‘আমাদের জাতি’— যার সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা একটা অবিভাজ্য জাতি নয়, তা শ্রেণিবিভক্ত জাতি—যার একদিকে মালিকশ্রেণি, অপরদিকে মজুরশ্রেণি। তাই এখানে ‘জাতীয় ঐক্য’, ‘জনগণের ঐক্য’, ‘যুবকদের ঐক্য’—এই কথাগুলির দু’টি মাত্র সংজ্ঞা হতে পারে, দু’টি অর্থে এই কথাটা বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করা চলে, তা হ’ল— হয় মালিকশ্রেণির স্বার্থে যুবকদের, জনগণের, দেশের মানুষের ঐক্য— আর না হয় মজুরশ্রেণির, শোষিতশ্রেণির স্বার্থে দেশের যুবকদের, দেশের জনসাধারণের, শোষিত মানুষের ঐক্য। ‘দেশের ঐক্য’—এই কথাটার শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মাত্র এই দু’টি সংজ্ঞা হতে পারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। আর বাকি সব ব্যাখ্যা দেশের নামে লোককে ধাপ্পা দেওয়ার বুর্জোয়া চালাকি মাত্র। তাই শ্রেণিচরিত্রের এবং শ্রেণিস্বার্থের উল্লেখ না করে শুধু ‘দেশের সংহতি’ ও ‘দেশের স্বার্থ’ কথাগুলো বললে চলবে না, ‘দেশের জন্য লড়ছি’— এরকমভাবে বুঝলেও চলবে না, চলতে পারে না। ‘প্রিসাইজলি’ (যথার্থভাবে) আপনাদের বুঝতে হবে যে, ‘দেশের স্বার্থ’ বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থের অর্থে কোন শ্রেণির স্বার্থের সাথে ঐতিহাসিকভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি শোষিতশ্রেণির স্বার্থের সাথে, শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থের সাথে, কৃষক-খেতমজুরদের স্বার্থের সাথে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের সাথে দেশের স্বার্থের প্রশ্নটি মিলিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এদেরই স্বার্থে দেশের আন্দোলন, যুবশক্তিকে পরিচালিত করা, যুবসমাজকে সুসংগঠিত করাই হবে দেশের কাজ করা। তাই ‘দেশের স্বার্থ’ কথাটার সাথে যুবকদের এই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, এই বিচার থাকা দরকার যে, তাঁরা ভারতবর্ষের এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে দেশের স্বার্থ বলতে যে স্বার্থের ঝান্ডা নিয়ে চলতে চাইছেন সেটা শোষকশ্রেণির স্বার্থ, না শোষিতশ্রেণির স্বার্থ। এই বিচারটি সমাধা না করে ভাসাভাসাভাবে ‘দেশ’ ‘দেশ’ করলে আমরা বার বার মালিকশ্রেণির চক্রান্তে পা দেব, তাদের হাতে শিকার হব, ইচ্ছা না থাকলেও হয়তো তাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করে বসে থাকব। এমন ঘটনা আগেও বহুবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটবে।

... আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত জিনিসটা যুবসম্প্রদায়ের কাছে রাখতে চাইছি এইজন্য যে, শুধু পশ্চিমবাংলা বলে নয়, ভারতবর্ষ বলে নয়, গোটা পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলনেই যুবসমাজ — শুধু মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুবকদের কথা নয়— শ্রমিক-চাষি যুবক, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল যুবক-যুবতীদের সম্মিলিত শক্তিই এই আন্দোলনের আসল প্রাণশক্তি। বুড়োরা, হিসেবিরা, সনাতনপন্থীরা কোনও দিন সমাজে তুফান তুলতে পারেনি, সমাজের পরিবর্তন আনতে পারেনি, সামাজিক সমস্যা শেষপর্যন্ত সমাধান করার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি, বা আন্দোলন পরিচালনা করেনি। যারা সমাজকে পাল্টেছে, যারা সভ্যতাকে গড়ার জন্য বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তারা সব দেশেই যুবসম্প্রদায়। আর, এই যুবসম্প্রদায় শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় নয়, শোষিতশ্রেণির যুবসমাজ।

মনে রাখতে হবে, দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এই চাষী-মজুর যুবকেরা— তাদের বাদ দিয়ে শুধু শিক্ষিত যুবকেরা একটা চিন্তা, একটা ভাবনা, একটা আলোড়ন, একটা আদর্শবাদ শুধুমাত্র এনে দিতে পারেন— কিন্তু আন্দোলনের প্রচণ্ড তুফান এবং জোয়ার এদের বাদ দিয়ে আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন না। দেশব্যাপী বিরাট যুব আন্দোলন আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন না চাষী-মজুর যুবক-যুবতীদের বাদ দিয়ে। তাই চাষি-মজুর ঘরের যুবকদেরও ব্যাপকভাবে যুব আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনবার কথা আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

“বুড়োরা, হিসেবিরা, সনাতনপন্থীরা কোনও দিন সমাজে তুফান তুলতে পারেনি, সমাজের পরিবর্তন আনতে পারেনি, সামাজিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত সমাধান করার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি বা আন্দোলন পরিচালনা করেনি। যারা সমাজকে পাল্টেছে, যারা সভ্যতাকে গড়ার জন্য বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তারা সব দেশেই যুব সম্প্রদায়।

কলেজে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ সহ নানা দাবিতে
মহিষাদলে শিক্ষা কনভেনশন

মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের অভাবে নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। অতি দ্রুত তা সম্পূর্ণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ সহ পঠন-পাঠনের পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে ১০ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন মহিষাদল রাজ কলেজের অধ্যাপক মানস কুমার জানা। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কনভেনশনের অন্যতম আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ রায়। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক বাসুদেব দাস, অধ্যাপক নোটন সিং, আইনজীবী মৌমিতা দাস,

মহিষাদল রাজ কলেজের গ্রন্থাগারিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, শিক্ষক শুভেন্দু শেখর দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ বেতাল সহ বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক এবং বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ অতিথি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত বেরা এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য দিলীপ মাইতি।

বক্তারা বলেন, এই জেলার মতো শিক্ষায় এগিয়ে থাকা জেলায় যেখানে ১৯টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে, সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা অল্প খরচে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কলেজ পাশ করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন করে কিন্তু আসন সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে এবং দূরত্বের কারণে বহু ছাত্রই মেধা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

জেলার ১৯টি কলেজের প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রপ্রতিনিধি ছিলেন কনভেনশনে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষক-অধ্যাপক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, চিকিৎসক থেকে শুরু করে অভিভাবকেরাও কনভেনশনে যোগ দেন। অধ্যাপক মানস কুমার মাইতিকে সভাপতি এবং বিশ্বজিৎ রায় ও বাসুদেব দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৬২ জনের কমিটি গঠিত হয়।

উন্নয়ন ও আচ্ছে দিনের ভাঁওতা নয়
চাকরির দাবিতে যুব আন্দোলনের ডাক

প্রাথমিকে টেট দুর্নীতি, এসএসসি দুর্নীতি, নার্স নিয়োগে দুর্নীতি, ভয়াবহ বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, দুয়ারে মদ প্রকল্প ও অগ্নিপথ প্রকল্প প্রতিরোধে এবং সকল বেকারের চাকরির দাবিতে দুর্বার যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৪ জুন পলাশীপাড়ার বারুইপাড়ায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জি, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস ও জেলা সম্পাদক কমরেড সেলিম মল্লিক। এই কর্মসূচিতে সঙ্গীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তব্য সহ ৪০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপাররা দাবি আদায়ে আন্দোলনের পথে

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়ন' এর দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে ভূমিদপ্তর তাদের অফিসে কর্মরত কর্মবন্ধুদের গ্রুপ-ডি কর্মচারীর স্বীকৃতির বিষয়ে ভাবনা শুরু করেছে। অথচ এই কর্মীদের বকেয়া টাকা মেটানোর ব্যাপারে হাওড়া ও উলুবেড়িয়া এসডিএলআরও অফিস নানা অজুহাতে টালবাহানা করছে। এর আগে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কলকাতায় ল্যান্ড ডাইরেক্টর অফিস অভিযান ও মার্চে দু'বার হাওড়া জেলা ল্যান্ড রিফর্ম অফিসে ইউনিয়ন আধিকারিকদের কাছে বিষটি তুলে ধরে। যার ফলে জেলা ভূমি দপ্তরের আধিকারিক মহকুমা দপ্তরে বকেয়া টাকা মেটানোর সার্কুলার দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় বকেয়া টাকা মেটানোর বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দিতে ১২ জুলাই হাওড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের 'ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়নের' কর্মবন্ধুরা হাওড়া সদর মহকুমা দপ্তরের অফিসে স্মারকলিপি দেন। পরে হাওড়া এডিএলআরও এবং ডিডিও-র সঙ্গে দেখা করা হয়। হাওড়া ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা দ্রুত বকেয়া মেটানোর ব্যাপারে আশ্বাস দেন।

নিয়মিত ও ন্যায্য বেতনের দাবিতে
আইডিবিআই ব্যাঙ্কে ঘেরাও

আইডিবিআই ব্যাঙ্কে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীরা নিয়মিত ও ন্যায্য বেতন থেকে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত। প্রচলিত আইনে প্রতি মাসের বেতন পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাওয়ার কথা থাকলেও আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীরা এক মাসের বেতন অনেক সময়ই দু-তিন মাস পরে পাচ্ছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন ভেন্ডর কন্ট্রাক্টরা ইচ্ছাকৃতভাবে মাসের পর মাস প্রাপ্য বেতনের কম বেতন দিচ্ছেন। এ বিষয়ে অগ্রণী ভেন্ডরের নাম হল 'সিসা'। এই নিয়ে একাধিকবার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে কোনও ফল না হওয়ায় ৮ জুলাই আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে কলকাতায় ব্যাঙ্কের সেক্সপিয়র সরণি জোনাল অফিস ঘেরাও করা হয়।

ওই দিন সকাল ৮টা থেকে অফিসের মূল ফটক আটকে কর্মীরা অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেন। জোনাল প্রধান, সিজিএম সহ অন্যান্য অফিসার ও কর্মচারীরা কাজে যোগ দিতে না পেরে অপেক্ষা করতে বাধ্য হন। অন্যান্য অফিসের কর্মী সহ বহু পথচলতি মানুষও অবরোধে সামিল হয়ে আন্দোলনকে সমর্থন জানান। ২ ঘণ্টা অবরোধের পর পুলিশের মধ্যস্থতায় সিজিএম আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। দীর্ঘ আলোচনায় কর্তৃপক্ষ দাবিসমূহের যৌক্তিকতা স্বীকার করে তা দ্রুত পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল, অশোক সাহা, ইউসুফ মোল্লা, নির্মল মাঝি, মনোজ মণ্ডল প্রমুখ।

চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন

রেল বেসরকারিকরণ ও রেলে ৯ হাজার পদ বিলুপ্ত করার প্রতিবাদে এবং 'সিকিউরিটির জব' নয় 'জব-এর সিকিউরিটির' দাবিতে অল ইন্ডিয়া আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ জুলাই দেশজুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। দিল্লি কর্ণাটক মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ বিহার ওড়িশা সহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলাতে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কলকাতায় ডিআরএম দপ্তরে রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভের কর্মসূচি হয়। নেতৃবৃন্দ বিজেপি সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পে ঠিকা সেনা নিয়োগের পরিকল্পনা ও বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করেন।

বল্লুকে বিক্ষোভ, ঘেরাও

২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা রাস্তা ২০২২-এও কংক্রিট হল না। চলার অযোগ্য রাস্তা কংক্রিট করার দাবিতে বারবার ডেপুটেশন, রাস্তা অবরোধ হয়েছে। প্রধান, বিডিও, পুলিশ প্রশাসন বারবার সংস্কারের কথা দিলেও আজ পর্যন্ত কোনও ভূমিকা তাঁরা পালন করেননি।

পূর্ব মেদিনীপুরের বল্লুক -১ অঞ্চলের সোয়াদীঘি খালের দক্ষিণ দিকের রাস্তা সহ উদয়চক, প্রসাদচক, সাবলআড়া গ্রামের চলার অযোগ্য রাস্তা কংক্রিট করার দাবিতে, কাঠের ভগ্ন ব্রিজগুলি কংক্রিট করার দাবিতে ১৪ জুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে হাজার খানেকেরও বেশি জনগণ। আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও প্রধান না থাকায় তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রধান এসে কথা না দেওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে বলে নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দেন। শেষে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় বিডিও জনগণের দাবির সাথে সহমত হন। তিনি কথা দেন, দ্রুত লোক পাঠিয়ে সার্ভে করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সোমনাথ ভৌমিক, স্বপন সামন্ত, গিরিধর অধিকারী, অঞ্জনা মাইতি প্রমুখ।

হাওড়ায় আশাকর্মীদের সভা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে ১০ লক্ষ আশাকর্মীকে তাঁদের কাজের জন্য গ্লোবাল হেলথ লিডারস পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের প্রতি চরম অবহেলা করছে। এর প্রতিবাদে এবং সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৫ জুলাই আশাকর্মীদের এক সভা হয়। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এই উদ্যোগ নেয়।

পাঁচ বছরে ভারতের অস্ত্র ব্যবসা ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

অস্ত্র-ব্যবসা ভারতেও জাঁকিয়ে শুরু হয়েছে। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে ভারত ১৩ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম বিদেশে রপ্তানি করেছে। এর ৭০ শতাংশ করেছে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি। ৩০ শতাংশ করেছে সরকার। ভারত অস্ত্র যেমন বিদেশ থেকে আমদানি করে, তেমনি বিদেশে রপ্তানিও করে। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে ভারত থেকে ২,০৫৯ কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। গত ৫ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ গুণের বেশি।

কোন কোন দেশে ভারতের অস্ত্র রপ্তানি হচ্ছে? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারত অস্ত্র রপ্তানি করছে। ভারতের অস্ত্র যাচ্ছে আমেরিকাতেও। এ বছর জানুয়ারি মাসে ২,৭৭০ কোটি টাকার ব্রহ্ম সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ভারত থেকে কেনার জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ফিলিপিন্স। ভারতের পুঁজিপতিরা আশা করছে ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামেও তাদের অস্ত্রের বাজার খুলে যাবে।

ভারত অস্ত্রশিল্পে খুবই জোর দিয়েছে। ভারতের ডিফেন্স সেক্রেটারি অজয়কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ডিফেন্সে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের (এআই) ব্যাপক প্রয়োগ ঘটছে। এ সংক্রান্ত আধুনিক ও উন্নত ৭৫ রকমের অস্ত্র ও প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এ ছাড়া আরও ১০০ রকমের যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। (টাইমস অব ইন্ডিয়া ঃ ০৯.০৭. ২০২২)

অগ্রসর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা, জাপান, জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি, ইংল্যান্ড বহু আগেই এই মারণ-ব্যবসায় ঢুকেছে। এখন ভারত এই ব্যবসায় যথেষ্ট জায়গা করে নিয়েছে। কেন এই মারণ-ব্যবসায়?

যুদ্ধাস্ত্র তৈরির পোশাকি নাম প্রতিরক্ষা শিল্প। নামটির সঙ্গে দেশের সুরক্ষার বিষয়টি যুক্ত করে এক জাতীয় গরিমা তৈরির চেষ্টা হয়। একে ঘিরে দেশ বাঁচানোর জিগির তোলে শাসকরা। এই আবেগ সাধারণত দু'ভাবে কাজ করে। যখন বহিঃশত্রুকে রুখে দেওয়া হয় তখন যেমন এই আবেগ প্রবল গতিতে উঠে আসে, তেমনি যখন পরদেশে হানা দিয়ে বিজয়ী হয়।

প্রতিরক্ষা নামটির সঙ্গে দেশরক্ষার মোড়ক থাকায় এই শিল্পে বেশি বেশি করে অর্থ বরাদ্দ মানুষ সমর্থনও করে। বিশ্বের সব দেশেই শাসকশ্রেণি এখন এই শিল্পে বেশি বেশি করে বরাদ্দ করছে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, কোনও দেশই বলছে না, তারা পরদেশ আক্রমণ করবে না। 'পরদেশ আক্রমণ করব না' এই নীতি সব দেশ মেনে চললে কোনও দেশেরই প্রতিরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। তারা এই ঘোষণা করে না কেন? কেন তারা তারা শুধু অস্ত্র তৈরির উপরই জোর দেয়? কেন অস্ত্র রপ্তানি করে? আবার অস্ত্র আমদানিও করে? কারণ অস্ত্রব্যবসাই আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধ, সন্ত্রাস এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজে অস্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বেড়ে চলেছে। বহু পূর্বেই মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়। কেন তিনি এ কথা বলেছেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বাজার সম্প্রসারণের জন্য পরদেশে হানা দেয়। পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পথে যে বাজার সংকটের জন্ম দেয় তার থেকে সাময়িকভাবে হলেও উদ্ধারের জন্য সে অর্থনীতিকে ক্রমাগত যুদ্ধনির্ভর করে তোলে। অর্থাৎ যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরিতে পুঁজিপতিরা বেশি বেশি করে ঝোঁকে। কারণ এই বাজারের একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আছে, যেহেতু সরকারই এখানে ক্রেতা। কিন্তু এর পরিণাম হল, সামরিক বাজেটে বেশি বেশি করে অর্থ বরাদ্দের ফলে অন্যান্য জনস্বার্থবাহী খাতে বরাদ্দ কমতে থাকে। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। শিক্ষায়, চিকিৎসায় কার্যকরী বরাদ্দ বাড়ার বদলে কমতে থাকে। সারে, বিদ্যুতে, গ্যাসে ভর্তুকি কমতে থাকে বা বন্ধ হওয়ার পথে যায়। এই ভাবে যুদ্ধ-অর্থনীতির কুফল জনজীবনে বর্তাতে থাকে। মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ছোট বড় মাঝারি সব পুঁজিবাদী দেশেরই এই প্রবণতা থাকে অর্থনীতিকে যুদ্ধমুখী করে তোলার।

এই মারণ খেলায় পুঁজিবাদ আজ মত্ত। সারা বিশ্বের মানুষ ইউক্রেন, রাশিয়া যুদ্ধের পরিণতিতে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে ধুঁকছে। এর থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে, শান্তির ভিত্তির উপর সমাজকে দাঁড় করাতে হলে পুঁজিবাদের অবসান এবং সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়।

শ্রমিক বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে বেলজিয়ামে

শাসকের বুকে কাঁপন ধরানো সুবিশাল শ্রমিক বিক্ষোভ এবং ধর্মঘটের সাক্ষী থাকল পূর্ব ইউরোপের বেলজিয়াম। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিদিনের বেঁচে থাকাকে ক্রমশ কঠিন করে তুলছে, অথচ তার সাথে সঙ্গতি রেখে আদৌ বাড়ছে না বেতন। এর প্রতিবাদে গত ২০ জুন আশি হাজারেরও বেশি শ্রমজীবী মানুষ সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন রাজধানী ব্রাসেলস-এর রাজপথে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, বামপন্থী দল এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। ছিলেন বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনের সদস্যরাও।

বেলজিয়ামের শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো নিয়ে লড়ছেন বহুদিন ধরে। এক বছর আগে শুরু হওয়া শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই এদিনের বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছিলেন তারা। দিনের পর দিন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে, একের পর এক অগণতান্ত্রিক শ্রমিক-বিরোধী নীতি চালু করে তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে চাপা দিতে চেয়েছে সরকার। ২০১৪তে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয় গোটা দেশ। সেই সময় থেকেই সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর সরকারি দমন-পীড়ন আরও মারাত্মক চেহারা নেয়। বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অপরাধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বহু কর্মী-সংগঠককে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হয়। এই সমস্ত অমানবিক, স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ অগ্নিসংযোগ করেছে জনগণের ক্ষোভের বারুদে, যা বোমার মতো ফেটে পড়ল ২০ জুন। হাজার হাজার মানুষ সোচ্চারে শাসক-বিরোধী স্লোগানে গলা মিলিয়েছেন, হাতে হাতে তুলে ধরেছেন সংগ্রামী ব্যানার। দাবি জানিয়েছেন, বেতন বাড়াতে হবে, হাসপাতাল এবং স্কুলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, জনগণের বেতন লুঠ করা চলবে না। সেদিনের শ্রমিক ধর্মঘট কার্যত স্তব্ধ করে দিয়েছে জনজীবন, দেশ জুড়ে বাস পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে, ব্রাসেলস এয়ারপোর্ট বাধ্য হয়েছে সমস্ত উড়ান বাতিল করতে।

বেলজিয়াম সহ ইউরোপের নানা দেশের শ্রমিকরা জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আরও জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, গোটা পৃথিবী জুড়েই বারবার জ্বলে উঠছে শ্রমিক বিক্ষোভের আগুন। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বাজার সংকট যত বাড়ছে, তার অনিবার্য পরিণতিতে আরও তীব্র হচ্ছে শ্রমিক শোষণ, বাড়ছে দারিদ্র-বেকারি-বৈষম্য। আর পৃথিবী জুড়ে ততই তীব্র হচ্ছে এই অন্যায় ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার আকুতি, অনিবার্যভাবে উঠে আসছে কার্ল মার্কস এর নাম, প্রস্ফুটিত হচ্ছে মার্কস-এঙ্গেলস প্রদর্শিত শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন। পুঁজির স্বর্গরাজ্য খোদ আমেরিকার বুকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে উঠে এসেছে মার্কস এর নাম, ২০২০ র অস্কারমঞ্চে 'আমেরিকান ফ্যাক্ট্রি' তথ্যচিত্রের নির্মাতা জুলি রেইচার্ট কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, সারা দুনিয়ার শ্রমিক যখন একজোট হবে, তখন পরিস্থিতির উন্নতি হবে'।

যত দিন যাবে, শোষিত মানুষের বিক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো ফেটে পড়বে কখনও ওয়াল স্ট্রিট, কখনও দিল্লির সিংঘু সীমান্তে কিংবা কলকাতার এসপ্ল্যানেডে, কখনও ব্রাসেলস এর রাজপথে, মুক্তিকামী মানুষের চিন্তায় চেতনায় আরও উজ্জ্বল, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দেবেন মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন। সঠিক নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণ খুঁজে নেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস নির্দেশিত পথ। মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো নানা দাওয়াই টোটকা দিয়ে যতই বাজার অর্থনীতিকে অক্সিজেন জোগাতে চাক, লাঠি-গুলি-কামান দিয়ে যতই পিষে মারতে চাক গণআন্দোলনকে, ঘুণ ধরা এই ব্যবস্থার পতন অনিবার্য।

বাঁকুড়ায় নাগরিক কনভেনশন

১৭ জুলাই বাঁকুড়া শহরের ডিওসি হলে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা আহ্বায়ক প্রবীণ নাগরিক সুব্রত সিংহ। সংগঠনের অন্যতম আহ্বায়ক আইনজীবী সুব্রত দাস মোদক প্রস্তাব পাঠ করেন। সমর্থনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার মাজী। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে শোষণে জর্জরিত জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মূল বক্তা সিপিডিআরএসের রাজ্য সহ সম্পাদক অধ্যাপক মঙ্গল নায়ক তাঁর বক্তব্যে সিপিডিআরএসের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষক অধ্যাপক আইনজীবী চিকিৎসক সকলকেই সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানান। সভা সঞ্চালনা করেন আইনজীবী হরিদাস ব্যানার্জী।

নাগরিক কনভেনশনে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা

পাঠকের মতামত

ডিমের বদলে নাড়ু

বিরাট গন্ধমাদন নিয়ে চলেছেন হনুমান। আবার কখনও বা এক লাফে লঙ্কা। এই অপরিসীম শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের শিক্ষাবিভাগের কর্তাব্যক্তিরা। নাড়ু ও গুড়ের মতো সাত্ত্বিক আহারই নাকি হনুমান এবং ভীমের ক্ষমতার সত্যিকার উৎস! অতএব আর কী! কর্ণাটকের মিড-ডে মিলে ডিম এবং কলার বদলে নাড়ু গুড়ের আগমন। ব্যাখ্যা হল, নিরামিষাশীরা যেহেতু ডিম খান না তাই ডিম, কলা দিলেই বৈষম্য। ভারত রাষ্ট্র কিংবা কর্ণাটক রাজ্য তো আর কোনও দিন বৈষম্য দেখেনি! পিথাগোরাস, নিউটন, ডারউইন আগেই বাতিলের খাতায়। এবার ডিম কলা বন্ধ করে কর্ণাটককে কিষ্কিন্ধা বানানোর ষোল কলা পূর্ণ! অতএব আর কী? এবার সবাই সাত্ত্বিক আহার করে হনুমানের মতো লাফ দিয়েই যাতায়াত করবে। তাতে পেট্রল, ডিজেল, পরিবহণ খরচের বৃদ্ধিতে পাবলিকের ক্যাচরম্যাচরও বন্ধ থাকবে। অলিম্পিকেও আসবে অনেক পদক। এক ঢিলে অনেক পাখি!

অনুপম ভট্টাচার্য
সল্টলেক

সমাজ দর্পণ

বেশ কিছু দিন ধরে কতগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় বাড়িয়ে চলেছে। আজ মানুষের উনুন জ্বালানোর কোনও উপায় থাকছে না। পর্যাপ্ত কাঠ ও গোবরের ঘুঁটেও পাওয়া যায় না। রেশনে কেরোসিন সহজ প্রাপ্য নয়, তার দামও ১০০ টাকা লিটার ছাড়িয়ে গেছে। রান্নার গ্যাসের দাম ১১০০ টাকার কাছাকাছি। খাবার জিনিসের দাম ক্রমবর্ধমান। এ দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিদ্যুতের মাশুল বাড়বেই।

আমরা যারা ছোটবেলায় কংগ্রেসি শাসন দেখেছি, কেরোসিনের দাম বাড়ার প্রতিবাদে ছাত্রদের মিছিল, বই-খাতার দাম বাড়ার প্রতিবাদে ছাত্রদের মিছিল ভোলার নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখতাম খবরের কাগজের পাতায় লেখা হত, আন্দোলন করে 'ঘেরাও মন্ত্রী'র দল। বড় হয়ে জেনেছি এই মন্ত্রী আসলে সুবোধ ব্যানার্জী। যখন যৌবনে পা রাখলাম দেখলাম দীর্ঘ ৩৪ বছরের সিপিএমের রাজত্বে শিক্ষার দাবিতে, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, হাসপাতালে চার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, ঢালাও মদের লাইসেন্সের বিরুদ্ধে, ব্যাপক নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলন করছে সেই 'ঘেরাও মন্ত্রীর' দলটাই।

কংগ্রেসের মতো করেই সিপিএম ফ্রন্ট, তারপর তৃণমূল শাসন— পার্থক্য পাওয়া ভার। প্রশ্ন জাগে, সব শাসকই কেন এমন জনবিরোধী? শাসক আসলে কার পক্ষে? তারা ঠিক কোন মানুষের উন্নতি চায়? দেশের নারী সুরক্ষা বলতেই বা তারা কী বোঝাতে চায়? শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা কী ভূমিকা পালন করছে? কেন তারা গবেষণাগুলোতে অর্থ সাহায্য ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে? কেন শিক্ষাকে ব্যবসায়ীকরণ করছে? আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও কেন কোনও শাসকই কৃষকের আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিল না? স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত তারা দেশজুড়ে শিক্ষার প্রসারে অবৈতনিক শিক্ষার প্রয়াস গ্রহণ করল না কেন? কেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার করেও নারী সুরক্ষায় কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করে না? ভাবতে লজ্জা করে একটা দেশে ৬ মাসের শিশু থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধাও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায় না।

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখছি গণদাবীর পাতায় তা বারবার উঠে আসে। এই পত্রিকাটির ভূমিকা বড়ই সদর্থক। পত্রিকাটি যথার্থই সমাজ দর্পণ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠছে। এর আরও বিস্তার ঘটুক।

পুষ্পিতা মালিক
কলকাতা - ৭৫

পাঠকের বিচারে গণদাবী

গণদাবীর ১৫ জুলাই সংখ্যাটি পড়ে পত্রিকাটি বর্তমান সময়ে বেশ আপ-টু-ডেট হচ্ছে মনে হল। 'তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফাই গ্যাসের অগ্নিমূল্যের কারণ' লেখাটিতে বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণটি তুলে ধরা হয়েছে। তার সাথে সরকারি তেল কোম্পানিগুলিকে ধীরে ধীরে বেসরকারি হাতে বিক্রি করে দেওয়া এবং বেসরকারি মালিকদের ইচ্ছেমতো মূল্যবৃদ্ধি জনগণের নাভিশ্বাসের কারণ হিসেবে সঠিক ভাবেই দেখানো হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে হরিয়ানায় 'চিরাগ-যোজনার' প্রসঙ্গে লেখাটিতে কী ভাবে সরকার বেসরকারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও বেতন দেওয়ার দায়িত্ব নিজে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা উঠে এসেছে। সরকারি স্কুলে গুরুত্ব না দিয়ে বেসরকারি স্কুলের খরচ কেন সরকার বহন করবে, কী তার গোপন উদ্দেশ্য, তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্য দিকে গরিব মানুষ মোটরভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলে তাতে বাধা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। গণদাবীতে সে খবরও এসেছে। একাধিক জায়গায় বিদ্যুৎ কোম্পানির অবহেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গ্রাহক সংগঠনের আন্দোলনের কথা সঠিক ভাবে এসেছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইতিহাস লেখায় ব্যগ্রতা নিয়ে লেখাটি সময়পোযোগী। তবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে দাবা খেলা কাশ্মীরে চলছে তা নিয়ে লেখাটিতে একটু পুরনো খবর পরিবেশিত হল। বর্তমান সময়ের নতুন খেলাগুলিকে উল্লেখ করলে প্রাসঙ্গিক হত। আন্দোলনগুলি ছবি সহ এসেছে, তাও বর্তমান সময়ের পরিপূরক। গণদাবী সাপ্তাহিক পত্রিকা হলেও দৈনিক পত্রিকাগুলির মতোই সমাজে জায়গা করে নিচ্ছে।

গোপাল সাহু
বারুইপুর

স্বাধীনতার 'অমৃতকালে' বেকারত্বের হলাহল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'পড়াশোনার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি নয়'। পড়াশোনার যে বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে সে কথাটা কে না জানে? কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন কী উদ্দেশ্যে? তাঁর ভেতরের কথাটা কী আসলে— শিক্ষিত বেকাররা আর চাকরি চেয়ে সরকারকে লজ্জা দেবেন না! বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মালিক প্রধানমন্ত্রীর গলায় হঠাৎ এই সুর কেন?

মানেটা বোঝা গেল আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থা সিএমআইই-র সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্ট সামনে আসতেই। এই রিপোর্ট দেখাচ্ছে শুধু জুন মাসেই দেশে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। ২০২২-এর প্রথম ৬ মাসেই ২৫ লক্ষ বেতনভুক কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন। এ বছর শুধু স্টার্ট-আপ সংস্থা থেকেই চাকরি গেছে ১২ হাজার মানুষের। এই অবস্থায় কাজ না পেয়ে কাজ খোঁজাই ছেড়ে দিয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। কেন চাকরি যাচ্ছে? কেন নিয়োগ হচ্ছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ লক্ষ পদ খালি পড়ে রয়েছে, নিয়োগ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্বাধীনতার 'অমৃতকালে' এই হতাশাজনক পরিস্থিতি কেন?

বাস্তবে বেকারত্বের প্রকৃত হার সরকার ঘোষিত হারের থেকে অনেক বেশি। সরকারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস (এনএসও) জানাচ্ছে, দেশের কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ৩৭ শতাংশ কিছু কাজ পান, ৬৩ শতাংশ কিছুই পান না। কিন্তু সরকার দেখাচ্ছে বেকারত্বের হার মাত্র ৭ শতাংশ। আসলে কাজ চেয়ে নাম লিখিয়েছেন যারা, এই শতাংশটা তাদের। প্রকৃত বেকার সংখ্যা নয়।

সরকারি রীতি শিরোধার্য করেই সিএমআইই জানাচ্ছে, হরিয়ানায় বেকারত্বের হার ৩০.৬ শতাংশ, রাজস্থানে ২৯.৮, আসামে ১৭.২, বিহারে ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ এই বিপুল সংখ্যার নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থী কোনও কাজই পাননি। নথিভুক্ত নয় সেই বিপুল সংখ্যার হিসাব নেই।

সরকারি কর্তাদের দাবি, এই সময় কৃষি মরসুম নয়, তাই কাজ কম। জুলাই মাসে মাঠে কাজ শুরু হলেই বাড়বে কর্মসংস্থান। শুধু কৃষিক্ষেত্রেই কি কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে? শহরাঞ্চলে কিংবা মফঃস্বলে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা কি কমেছে? তা হলে ২০২১ সালের সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী প্রথম তিন মাসেই শুধু ২৬ শতাংশ বেকার-বৃদ্ধি হল কী করে? গত এক বছরে কর্মসংস্থানের হার সর্বনিম্ন হল কী করে? যুক্তি তোলা হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের সারা বছর কাজ থাকে না। তাই এ সময় বেকারের সংখ্যা বেশি। জুন মাসে যে শ্রমিকের কাজ নেই, জুলাই-আগস্ট মাসে তার কাজ থাকবে, সেটা তারা নিশ্চিত ভাবে বলছেন কী করে?

প্রধানমন্ত্রীর না জানার কথা নয় যে, এই চরম বেকারত্বের কারণে পিএইচডি, মাস্টার ডিগ্রিধারী যুবক-যুবতীরা ঝাড়ুদার থেকে ডোমের কাজের জন্য লাইন দিচ্ছেন। ভারত জুড়েই এই চিত্র। এই বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালায় অভাবগ্রস্ত পরিবারগুলির অনাহার, অর্ধাহার আজ কোনও গোপন তথ্য নয়। এ দেশের ৯৭ কোটি মানুষ যে সুষম খাদ্যটুকু পান না, তাও কি প্রধানমন্ত্রী জানেন না!

এমন তো নয় এ দেশে মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছু এত তৈরি হয়েছে যে আর তা উৎপাদনের প্রয়োগন নেই! তাই কাজের সুযোগও কমে যাচ্ছে! বরং উল্টোটাই তো সত্য যে, কোটি কোটি মানুষ তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসও পান না। তা হলে তা জোগাতে হলে আরও উৎপাদন চাই। তাতে আরও মানুষের কাজের সুযোগই তো হওয়ার কথা। হচ্ছে না কেন?

আসলে মানুষের যতই প্রয়োজন থাক, ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় সাধারণ মানুষ কিনতে পারছে না। অবিক্রিত পণ্য গুদামে জমে যাচ্ছে। ফলে মজুর কাজ করতে চাইলেও তার শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। মুনাফা অটুট রাখতে যতটুকু উৎপাদন না করলে নয়, মালিকরা তার বেশি করবে না। মুনাফার স্বার্থে একচেটিয়া মালিকরা চড়া দামে বিক্রি করছে অবিক্রিত পণ্য, মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ব্যাপক হারে। শিল্প-কারখানায় শ্রমিক নির্ভরতা কমিয়ে যন্ত্রনির্ভরতা বাড়ানো হচ্ছে। পরিণামে বেশি বেশি করে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। এই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে যে পুঁজিপতি শ্রেণি, তারা তাদের মুনাফার জন্য যতটা প্রয়োজন শ্রমিক নিয়োগ করছে, তাকে খাটাচ্ছে, কাজ ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

অন্য দিকে যে সরকারই ক্ষমতার মসনদে থাকুক— কংগ্রেস বা বিজেপি তারাই বেসরকারিকরণের নীতি প্রয়োগ করছে। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকারগুলি বেকারদের কাজ দেওয়ার দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে অবলীলায়। সরকারের মালিক তোষণ নীতির ফলে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে, কলে-কারখানায় প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন পদ তৈরি হচ্ছে না, উল্টে হাজার হাজার পুরনো পদ বিলোপ করা হচ্ছে। অনিবার্য পরিণামে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গ্রামে চাষবাসও বাজার-অর্থনীতির এই নিয়ম মেনেই হয়। ফলে সেখানেও কৃষি-মজুর উদ্বৃত্ত হচ্ছে, গ্রামীণ বেকাররা শহরে কোনও একটা কাজের খোঁজে চরকিপাক খাচ্ছে।

শাসক দলগুলি চায়, সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম যে বেকার সমস্যা, অনাহার, দারিদ্র সেই সত্যটা যেন সাধারণ মানুষ না বোঝে। তা হলে প্রকৃত শত্রুকে চিনতে পারবে মানুষ। লড়াইটাও হবে পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থা ও তার রক্ষক ক্ষমতামত্ত দলগুলির বিরুদ্ধে সচেতন শ্রমিকের সংঘবদ্ধ লড়াই। তাতেই এত আতঙ্ক। আসলে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে যত দিন খেটে খাওয়া মানুষকে দিয়ে তা সইয়ে নেওয়া যায় ততদিনই লাভ শাসক দলের, তাদের প্রভু পুঁজি মালিকদের। সে জন্যই সঙ্কটের আসল কারণকে প্রকাশ না করে তাকে চাপা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা।

শ্রীলঙ্কা ঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকেই গেল

একের পাতার পর

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়মেই ব্যবসা-বাণিজ্য, চা-কফির মতো বৃহৎ বাগিচা ফসলের চাষ ও পর্যটন শিল্পের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে সে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই শ্রেণির কিছু মানুষের আর্থিক রমরমা ঘটলেও আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষ বেকারি, গরিবির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে ঋণের শর্ত মেনে ক্রমেই কমেছে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে সরকারের অর্থ বরাদ্দ। স্বাভাবিক কারণেই সরকারবিরোধী ক্ষোভ জমা হতে থেকেছে তাদের বুকে।

স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্টের জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ

এদিকে ২০১৯-এ উগ্র সিংহলী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী আবেগে ভর করে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন গোতাবায়া রাজাপক্ষে। ক্ষমতায় বসেই নিজের দাদা, পূর্বতন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছেন তিনি। নিজের আরও দুই ভাই সহ পরিবারের অন্যান্যদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে বসিয়ে দিয়ে সরকারের ওপর রাজাপক্ষে পরিবারের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছেন গোতাবায়া। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক বিলাসী জীবন যাপন করার পাশাপাশি এইসব ক্ষমতাশালীরা বেআইনি ভাবে বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া ক্ষমতায় বসেই পুঁজিপতিদের জন্য বিপুল কর ছাড়ের ব্যবস্থা করেন। পর্যটন শিল্পের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রায় ৬০ শতাংশ করছাড় দেন তিনি। ফলে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ায় এমনিতেই বাণিজ্য ঘাটতিতে ভোগা শ্রীলঙ্কায় সরকারি আয়ের পরিমাণ ব্যাপক ভাবে কমতে থাকে। এই অবস্থায় নেমে আসে কোভিড অতিমারির বিপর্যয়। তছনছ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার পর্যটন শিল্প। রাজকোষ ঘাটতি ভয়ঙ্কর আকার নেয়। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে টান পড়ে। তীব্র আর্থিক সঙ্কট মাথা তোলে। সার আমদানি ও সরকারি ভরতুকির খরচ কমাতে দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখে প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে আচমকা রাসায়নিক সারের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে শ্রীলঙ্কার চাষবাস ও বিশেষ করে বাগিচা শিল্প। কিন্তু কোনও ভাবেই এই প্রবল আর্থিক সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি গোতাবায়া সরকার। খাদ্যশস্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছুঁতে থাকে। অমিল হয় দুধ, শিশুখাদ্য সহ পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিনের মতো অপরিহার্য জ্বালানি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বিদ্যুৎ ছাঁটাই চলতে থাকে। চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। গোতাবায়া সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকে।

গতি পেল বিক্ষোভ

রাসায়নিক সার নিষিদ্ধ হওয়ায় চাষবাসের ক্ষতিকে কেন্দ্র করে গত এক বছর ধরেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন শ্রীলঙ্কার কৃষিজীবী মানুষ। শিক্ষক ও বাগিচা শ্রমিকরাও বেতন-মজুরি বৃদ্ধি সহ অন্যান্য দাবিতে বারবার রাস্তায় নামছিলেন। এবার দেশে চরম আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসায় এ বছরের মার্চ মাস থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে রাজধানী কলম্বো সহ দেশের নানা প্রান্তে-প্রত্যন্তে। হাজার হাজার খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কোনও সংগঠিত নেতৃত্ব ছাড়াই এই গণবিক্ষোভ এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, আতঙ্কে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে। প্রাসাদ ছেড়ে পালান তিনি। চলে যান নৌবাহিনীর আশ্রয়ে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন রনিল বিক্রমসিংঘে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের নিরস্ত্র করা যায়নি। প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান ওঠে 'গো গোতাবায়া গো'। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বহু জায়গায় কার্ফু জারি হয়। জরুরি অবস্থা জারি করেন রাজাপক্ষে। নামানো হয় বিশেষ টাস্ক ফোর্স ও আধা সামরিক বাহিনীকেও। কিন্তু দুর্দম জনতাকে কোনও মতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি গোতাবায়া সরকার। দিনের পর দিন জীবনের তোয়াক্কা না করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে মানুষ। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান। আহত হন অসংখ্য। মাসের পর মাস ধরে জনবিরোধী গোতাবায়া সরকারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে থাকে জনতার প্রবল ক্ষোভ। পাঁচ মাস ধরে বিক্ষোভের পর অবশেষে আসে ঘটনাবহুল ৯ জুলাই। সেদিন প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ছেড়ে নৌবাহিনীর কাছে আশ্রয় নেন গোতাবায়া। এবং তাঁর পালাবার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ ঢুকে পড়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ও সচিবালয়ে। জাতীয় পতাকা হাতে দখল নিয়ে নেয় সেগুলির। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কোনও ভাবেই বাধা দিতে পারেনি এই বিপুল জনস্রোতকে। সেদিন থেকে ১৪ জুলাই অবধি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদ ও সরকারি দপ্তরগুলি ছিল কার্যত জনতার দখলে। শ্রীলঙ্কা থেকে প্রথমে মলদ্বীপে ও তারপর সেখান থেকে তাড়া খেয়ে সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি গেড়ে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া ১৪ জুলাই দেশে পদত্যাগপত্র পাঠান। এ খবর জেনে কার্ফু উপেক্ষা করে উৎসবে মাতেন বিক্ষোভকারীরা। পরদিন প্রাসাদ ও সরকারি দপ্তর ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির দখল নেয় দেশের সামরিক বাহিনী।

জনগণের জাগ্রত শক্তির কাছে অত্যাচারী শাসকের ক্ষমতা তুচ্ছ

পূর্বতন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে ২০০৫ সালে তামিল সংখ্যালঘু নিধনে যে নৃশংস বর্বরতার পরিচয় রেখেছিলেন পলাতক সদ্যপ্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া, তা তাঁকে ঘিরে আতঙ্ক মিশ্রিত সমীহের এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের হাওয়া তুলে তামিল জনগোষ্ঠীকে বুটের তলায় পিষে দিয়ে তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী-বৌদ্ধদের সমর্থন আদায় করেছিলেন। গোতাবায়া প্রতিরক্ষা সচিব থাকাকালীন খুন করা হয়েছিল প্রায় ৭৫ হাজার সিংহলী-তামিলকে। মিলিটারিসুলভ শৃঙ্খলা অনুসরণকারী আধিপত্যবাদী গোতাবায়া বরাবরই উগ্র জাতীয়তাবাদী আবেগে হাওয়া দিয়ে গিয়েছেন। দুর্বল হয়ে পড়া তামিল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার আর সেই সুফল দিচ্ছে না বুঝে ইদানীং শ্রীলঙ্কার মুসলমান সম্প্রদায়ের দিকে তিনি তাক করেছিলেন ঘৃণার তীর। পাশাপাশি সরকারি ক্ষমতার বলে বাজেটের প্রায় ৭০ শতাংশ নিজের পরিবারের নিয়ন্ত্রণে এনে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে প্রবল প্রতাপশালী, অপ্রতিরোধ্য শাসকের নিজস্ব এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। এ হেন গোতাবায়াকে যে ভাবে প্রথমে প্রাসাদ ছেড়ে ও পরে সুযোগ বুঝে বিক্ষোভকারীদের হাত এড়িয়ে বিদেশে পালাতে হল, যে ভাবে দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের প্রবল ঘৃণার স্রোত তাঁকে দেশছাড়া করল, তাতে এ কথা আরও একবার পরিষ্কার হল যে, শাসক যত পরাক্রমশালীই হোক, জনগণের জাগ্রত শক্তির কাছে তার ক্ষমতা তুচ্ছ।

জনজীবনের মূল সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের এই সংগ্রামী মেজাজ, প্রাণের পরওয়া না করে শ্রীলঙ্কার হাজার হাজার মানুষের এই অভ্যুত্থান বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের অভিনন্দন কুড়িয়েছে। অনেকে এই গণঅভ্যুত্থানকে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে শীতপ্রাসাদ দখলের সঙ্গে তুলনা করে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাস্তবে দুটি ঘটনায় মূলগত পার্থক্য রয়েছে। রাশিয়ার বিপ্লবী জনগণ ১৯১৭ সালে শীতপ্রাসাদ দখল করে শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে জনগণের রাজ কায়েম করেছিল। সেখানে একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, আপাতদৃষ্টিতে দাবি আদায় হয়েছে বলে মনে হলেও, বাস্তবে শ্রীলঙ্কার এই গণঅভ্যুত্থানে সেখানকার জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি সমাধানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ার দেশ ছেড়ে পালানো ও শেষপর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে পদত্যাগের ঘটনা শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। প্রাসাদের দখল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাই অকাতরে মিষ্টি বিলিয়েছেন তাঁরা, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। হয়তো ভেবেছেন, আধিপত্যবাদী, স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বজনপোষক প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করানোর দাবি তো আদায় হয়েছে, ফলে এবার আন্দোলনের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ঘটল।

কিন্তু গোতাবায়াকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর স্লোগানের পিছনে মূল দাবি ছিল বেকারি, গরিবি, মূল্যবৃদ্ধির মতো যে সমস্যাগুলি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে, সেগুলি থেকে মুক্তি। আসল চাওয়া ছিল, সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, জনগণের সম্পত্তির অবাধ লুঠতরাজ বন্ধ হোক। জনগণ চেয়েছেন পুঁজিপতি তোষণকারী নীতি থেকে সরে এসে সরকার জনস্বার্থ রক্ষায় নজর দিক। 'রাইট টু রিকল' অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনবিরোধী কাজ বা দুর্নীতি করলে, তাঁদের পদ থেকে সরানোর অধিকার চেয়েছেন তাঁরা। চলতি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তথা শ্রীলঙ্কার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোটিকে অটুট রেখে শুধু প্রেসিডেন্ট বদলে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবি কী করে আদায় হওয়া সম্ভব?

সমস্যার মূলে আঘাত করতে পারেনি এই গণবিক্ষোভ

অত্যন্ত আফশোসের কথা যে, প্রাণ বাজি রাখা প্রবল এই গণআন্দোলন সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার মানুষের কাঙ্খিত দাবি-দাওয়াগুলি আদায় হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। শোষণমূলক যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁদের সকল সমস্যার মূলে রয়েছে, তার গায়ে এই বিক্ষোভ সামান্য আঁচড়টুকুও কাটতে পারেনি। বিক্ষোভের ব্যাপকতা দেখে দেশের সেনাবাহিনী তা প্রতিরোধে সক্রিয় হয়নি ঠিকই, কিন্তু প্রাসাদ ও সরকারি দপ্তরগুলি থেকে বিক্ষোভকারীরা সরে যাওয়া মাত্রই সেগুলির দখল নিয়ে নিয়েছে তারা। পার্লামেন্টের সামনে এখন পুলিশের ব্যারিকেড। মোতায়েন রয়েছে শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের পাহারাদার সেনাবাহিনী। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় তারা মুড়ে রেখেছে পার্লামেন্টের ভিতরে থাকা প্রতিনিধিদের।

এই প্রতিনিধিরা কারা? এরা কি শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের রক্ষক? একেবারেই তা নয়। সেখানে রয়েছেন শাসকদল এসএলপিপি-র সদস্যরা। পার্লামেন্টে এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া ছিলেন এই এসএলপিপি-রই নেতা। এর বাইরে বিরোধী দলের সদস্যরা যাঁরা পার্লামেন্টে আছেন, তাঁরা সকলেই স্থিতাবস্থার পক্ষে, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিরই সক্রিয় সমর্থক। আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁদের কারওরই সুনজর নেই। এঁরা সকলেই চেয়েছেন, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে উঠেছে, যে কোনও প্রকারে তা নিভিয়ে কত দ্রুত আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর সংখ্যালঘু ধনী ও প্রভাবশালীদের শোষণের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া যায়। সে কাজে সফলও হয়েছেন তাঁরা। তাই গোতাবায়ার পদত্যাগের পরে পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁরা সৎ, নিরপেক্ষ, সংগ্রামী, জনস্বার্থের রক্ষক কাউকে নয়, বেছে নিয়েছেন রনিল বিক্রমসিংঘেকে। এই রনিল শুধু এসএলপিপি-রই একজন নেতা তাই নয়, ইনি হলেন স্বয়ং গোতাবায়া মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধেও রয়েছে দুর্নীতির বহু অভিযোগ।

গোতাবায়াকে পদত্যাগ করিয়ে দেশ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো গণবিদ্রোহের বাঘটিকে যেই এই নেতারা একবার খাঁচায় পুরতে সক্ষম হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে তাঁদের জনস্বার্থবিরোধী স্বরূপ। বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর পার্লামেন্টের ভিতরে শান্তিতে বসে এবার তাঁরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করেছেন, দলীয় প্রার্থীদের নাম মনোনীত করেছেন। এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে জনগণের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন তাঁরা। কেড়ে নিয়েছেন মানুষের ভোটদানের অধিকার। ঠিক হয়েছে, এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন জনপ্রতিনিধিদের গোপন ভোটে। ১৯৭৮ সালের পর এই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে।

এখানেই শেষ নয়। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে রনিলের আরও

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ত্রাণ সংগ্রহে এসইউসিআই(সি) কর্মীরা

আসামে প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দলের উদ্যোগে ১৬-১৭ জুলাই রাজ্য জুড়ে ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়। ছবি বাম দিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও ডান দিকে কলকাতা

জাতিগত বিশুদ্ধতার মিথ্যা প্রচারে জেনেটিক গবেষণার ভান বিজেপি সরকারের

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণের জন্য একটি প্রজেক্ট করতে যাচ্ছে এবং এই সংক্রান্ত গবেষণায় প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করছে বলে সংবাদে প্রকাশ। সংবাদে এও প্রকাশ যে, এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ভারতীয়দের জাতিগত বিশুদ্ধতা, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে চায়।

এই প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছেন জীববিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা। ভারতের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের ১২০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট ব্যক্তি সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে পাঠানো এক প্রতিবাদপত্রে বলেছেন, এটা একটা অবাস্তব এবং ভয়ঙ্কর কার্যক্রম যা সামাজিক সম্প্রীতি ও সমন্বয়কে বিপন্ন করবে। প্রতিবাদপত্রে তাঁরা বলেছেন, জীবের জাতিগত ধারণা বহু আগেই বাতিল হয়ে গেছে। বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে যতটুকু জিনগত গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায় পূর্ববর্তী বহু সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ। ফলে বিশুদ্ধতার প্রশ্নটিই অবৈজ্ঞানিক। তা হলে কেন সরকার এটা করতে যাচ্ছে? কী তার নিগূঢ় রহস্য?

জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের সাথে হিন্দুত্বের যোগসূত্র জিনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করার দূরভিসন্ধিও এর পেছনে থাকতে পারে বলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আশঙ্কা। প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেছেন পার্থ মজুমদার (প্রাক্তন ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিকেল জেনোমিক্স, কল্যাণী), রাঘবেন্দ্র গাদাগকর (ইকলজিস্ট), ভি নাঞ্জুডিয়া (ইভলিউনশারি বায়োলজিস্ট বাঙ্গালোর), জীববিজ্ঞানী এল এস শশীধরা (অশোকা ইউনিভার্সিটি, হরিয়ানা), ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ, রোমিলা থাপার এবং অ্যানথ্রোপলজিস্ট কৈলাস মালহোত্রা।

হিটলারের ফ্যাসিস্ট কার্যক্রমের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই প্রয়াসের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু জনগণকে সম্মোহিত করার ক্ষেত্রে হিটলারি ক্ষমতার ধারেকাছেও নেই প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁর এই সব কাজের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই উঠছে প্রতিবাদ। এটাই রূপোলি রেখা।

মেচেদায় স্বাস্থ্য কনভেনশন

জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন'-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার আহ্বানে ২৩ জুন মেচেদা বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনের অডিটোরিয়াম হলে কনভেনশন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, রাজ্য কনভেনর ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস, জেলা সভাপতি ডাঃ এন কে প্রধান, সম্পাদক ডাঃ জয়দেব ঘড়া, প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি অর্জুন ঘোড়াই, সম্পাদক রামচন্দ্র সাঁতরা প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত করার প্রতিবাদে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত প্রতিরোধে জেলাব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে গ্রামীণ চিকিৎসক সহ সর্বস্তরের নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কনভেনশন থেকে রামচন্দ্র সাঁতরা, দীপক জানা, প্রণব মাইতিকে আহ্বায়ক করে জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখা গঠিত হয়।

ঢাকায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্মরণসভা

বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ঢাকায় বিএমএ মিলনায়তনে। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ও সভা সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অনলাইনে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এছাড়া বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লিগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সভাপতি মোস্তফা ফারুক বক্তব্য রাখেন।

ঢাকার বিএমএ মিলনায়তন হলে মহতী সমাবেশের একাংশ। কলকাতায় এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় অফিসে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন (ইনসেট)

শ্রীলঙ্কা ঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকেই গেল

সাতের পাতার পর

একটি মন্তব্যে। অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরেই তিনি বলেছেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বলেছেন, 'বিক্ষোভকারী ও দাঙ্গাকারীদের মধ্যে পার্থক্য আছে'। জনসাধারণের যে বিক্ষোভে মাত্র ক'দিন আগে তাঁদের 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠেছিল, বিক্ষোভের উত্তাপ ঠাণ্ডা হতে না হতেই তাকে দাঙ্গা বলে দাগিয়ে দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না তিনি!

প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলন

এই সাহস রাষ্ট্রনায়করা পাচ্ছেন কোথা থেকে? এখানেই রয়েছে শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক এই গণবিক্ষোভের দুর্বলতা। দখল করা প্রাসাদ ও সরকারি দপ্তর খালি করে দেওয়ার আগে যদি আন্দোলনকারীরা পার্লামেন্টের কাছ থেকে দাবি মানার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারতেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনসাধারণের ভোট দানের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা রুখে দিয়ে নির্বাচনকেও আন্দোলনের অংশে পরিণত করতে পারতেন এবং নিজেদের দাবিগুলি একে একে পূরণ হচ্ছে কি না, সে দিকে নজর রেখে, প্রয়োজনে আবার তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলার মতো করে সংগঠিত হতে পারতেন, তাহলে এই অসামান্য গণবিক্ষোভের এমন পরিণতি হত না।

কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল সঠিক মার্ক্সবাদী বিপ্লবী নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন, যার একান্ত অভাব দেখা গেল শ্রীলঙ্কায়। প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ার 'গণকমিটি' গঠনের। আন্দোলন একটা পর্যায়ে থেমে গেলেও এই কমিটিগুলি সরকারের কার্যকলাপের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পারত। সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে এই গণকমিটিগুলি আবার দেশজোড়া আন্দোলনের ডাক দিতে পারত। সরকারকে বাধ্য করতে পারত দাবি মানতে। এইভাবে একটার পর একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে তুলতে সমস্ত সমস্যার মূল, দেশে কায়েম থাকা শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই উচ্ছেদের সংগ্রামে দেশবাসীকে সামিল করতে পারত। যতদিন গণবিক্ষোভগুলি এই অভিমুখে, সঠিক পদ্ধতি ও নেতৃত্বে সংগঠিত হতে না পারবে, ততদিন সেগুলির এমন পরিণতিই হবে, অত্যন্ত দুঃখের হলেও যা ঘটারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক অসমসাহসী, বীরত্বপূর্ণ অসাধারণ গণবিক্ষোভ বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে এই শিক্ষাই রেখে গেল।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com